Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২১

৪৪ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২১, সোমবার, ৩ আশ্বিন, ১৪২৮

কমিউনিস্ট নেতা ও চিকিৎসক গৌরাঙ্গ গোস্বামীকে স্মরণ কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য, রাজ্যের জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা নেতৃত্ব, জননেতা, বিশিষ্ট চিকিৎসক, কমিউনিস্ট নেতা ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী গত ৪ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন। কালনা অম্বিকা মহিষমর্দিনী বিদ্যালয় মাঠে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে আজ কমিউনিস্ট নেতা ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামীর স্মরণ-সমাবেশে অংশ নেন কয়েক হাজার মানুষ। স্মরণ-সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পার্টির পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। সভার প্রধান বক্তা বিমান বসু বলেন, ছয়ের দশক থেকেই কলকাতায় তাঁর সঙ্গে পরিচয়। ছাত্র আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে ছাত্র সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন গৌরাঙ্গ গোস্বামী। চিকিৎসকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি মানুষের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ ছিলেন। চিকিৎসক হিসাবে বহু মানুষকে বাঁচিয়েছেন। প্রথম দিকে ২ টাকা ফি, পরে ৫ টাকা ফি নিয়ে চিকিৎসা করতেন। সবদিক থেকে তিনি ছিলেন একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট।

সভার শুরুতে প্রয়াত গৌরাঙ্গ গোস্বামীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। শুরুতে মাল্যদান করেন আজকের সভার সভাপতি অচিন্ত্য মল্লিক, সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য বিমান বসু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা অঞ্জু কর, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী, সারা ভারত কৃষক সভা পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক অমল হালদার, সারা ভারত কৃষক সভা পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, অরিন্দম কোঙার, সুকান্ত কোঙার, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, অঞ্জন চ্যাটার্জী, তাপস চ্যাটার্জী প্রমুখ নেতৃত্ব ও অসংখ্য গুণগ্রাহী মানুষ। প্রয়াত গোস্বামীর পরিবারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তাঁর স্ত্রী মালবিকা গোস্বামী এবং তাঁর পুত্র আনন্দ, পুত্রবধূ ও অন্যান্যরা। সভায় শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন সভাপতি অচিন্ত্য মল্লিক। এর পূর্বে ১৬ সেপ্টেম্বর পুরশ্রী হলে প্রাক্তন পৌরপতি গৌরাঙ্গ গোস্বামীকে স্মরণ করেন পৌর কর্মচারীরা।

ফ্যাসিস্টীয় কায়দায় আক্রান্ত ত্রিপুরার পাশে বর্ধমান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ১৯ সেপ্টেম্বর : ফ্যাসিস্টীয় কায়দায় আক্রান্ত ত্রিপুরার মানুষের পাশে দাঁড়ালেন বর্ধমান জেলার মানুষও। ৭ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরায় সিপিআই(এম) দপ্তর নেতা কর্মীদের বাড়ি সহ গণমাধ্যমের দপ্তরগুলির উপর আক্রমণ চালায় বিজেপির গুণ্ডাবাহিনী। বহু অফিস ও বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে সবর হন সর্বস্তরের মানুষ। সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটি ত্রিপুরায় আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অর্থ সংগ্রহের আহ্বান জানায়। গোটা দেশেই এই অর্থ সংগ্রহ চলছে। বর্ধমান জেলাতেও ১৯-২০ সেপ্টেম্বর গণসংগ্রহের ডাক দেওয়া হয়। জেলার বিভিন্ন এলাকাতেই গণসংগ্রহ অভিযান চলছে। বর্ধমান শহরের নীলপুর বাজার, নতুনগঞ্জ বাজার, বড় বাজারে গণসংগ্রহ হয়েছে। গলসীর খেতুড়া গরুর হাটে ত্রিপুরার আক্রান্তদের জন্য গণ সংগ্রহ হোলো। সিপিআই(এম) গলসী-২ এরিয়া কমিটির সম্পাদক কাজী জাফর আলি সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। কুলগড়িয়া চটিতেও গণসংগ্রহ হয়েছে।

ভারত বন্ধের সমর্থনে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৯ Öçö VÂ û: বাম গণসংগঠন ছাত্র-যুব মহিলাদের যৌথ উদ্যোগে সোমবার ভারত বনধ-এর সমর্থনে সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাতিস্বর বাজারে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন মিতালী মুখার্জী, সম্রাট ব্যানার্জী, পিযুষ চ্যাটার্জী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন মহিলা নেত্রী অঞ্জলী মণ্ডল। বক্তারা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার পুঁজিপতিদের হাতে দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। সেই লক্ষ্যে আনা হয়েছে তিনটি কৃষি আইন। এর বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। এই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ আন্দোলনকে প্রতিহত করতে করা হচ্ছে দমন-পীড়ন। হরিয়ানায় আন্দোলনরত কৃষকদের উপর সম্প্রতি নামিয়ে আনা হয়েছে অমানবিক অত্যাচার। সরকারের এইসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত বন্ধের ডাক দিয়েছে সংযুক্ত কিষান মোর্চা। এই ভারত বন্ধকে সর্বাত্মকভাবে সফল করতে হবে।

আজ বর্ধমান শহরের লক্ষ্মীপুর মাঠ, জিটি রোড পাঞ্জাবিপাড়া এলাকায় বনধের সমর্থন বাড়ি বাড়ি লিফলেট বিলি ও পোস্টারিং হয়েছে।

কৃষকসভার সম্মেলনগুলি চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ১৯ সেপ্টেম্বর : সারা ভারত কৃষক সভা ভাতার ১ ব্লক কমিটির অষ্টম সম্মেলনে উদ্বোধন করেন কৃষক নেতা আলমগীর মণ্ডল।

আব্দুর রাজ্জাক মণ্ডল নগর (বামশোর) ও অমর মল্লিক প্রদীপ দত্ত নামাঙ্কিত মঞ্চে জীবন বাজি রেখে এবং শত্রুর চোখে চোখ রেখে কথা বলার শপথ নিলেন বলগোনা বড়বেলুন মহাচান্ডা আমারুন ভাতার প্রভৃতি গ্রাম ও অঞ্চল থেকে আগত কৃষক প্রতিনিধিরা। সম্মেলন কে অভিনন্দন জানান জেলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা দুর্যোধন সর।

১) তিনটি কৃষক বিল প্রত্যাহারের দাবিতে ২৭ সেপ্টেম্বর সাধারণ ধর্মঘট কে সফল করার আহ্বান ২) সাম্প্রদায়িক বিজেপি ও আরএসএস এর বিরুদ্ধে লড়াই কে জোরদার করা ৩) সরকারি দরে ফসল কিনতে হবে। এই তিনটি প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়।

এদিন সম্মেলন মঞ্চ থেকে তাৎক্ষণিক ডাক দিয়ে ত্রিপুরার সংগ্রামী মানুষদের জন্য সংগ্রহ করা ২৭০০ টাকা উপস্থিত পূর্ব বর্ধমান জেলা কৃষক সভার সম্পাদক সৈয়দ হোসেনের হাতে তুলে দেন সম্মেলনের সভাপতি মণ্ডলীর পক্ষে সুভাষ মন্ডল।সম্মেলন মঞ্চ থেকে সর্বসম্মতভাবে নজরুল হক কে সম্পাদক সুভাষ মণ্ডলকে সভাপতি করে ২৫ জনের কমিটি নির্বাচিত হয়। গোলেনুর বেগম, ইন্দ্রজিৎ হাজরা এবং সুভাষ মন্ডল এর সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলন

—এরপর চারের পাতায়

জোরদার আন্দোলনের ডাক সমবায় কর্মচারীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৯ সেপ্টেম্বর : বিভিন্ন দাবিতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতির রাজ্য কমিটি। পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত নিমতলাস্থিত সমুদ্রগড় পরিষেবা সমিতির সভাগৃহে অনুষ্ঠিত রাজ্য কমিটির বর্ধিত সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজ্যের ১১ টি জেলার ৯৬ জন প্রতিনিধি এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন—রাজ্য সভাপতি দেবাশিস পানি, সাধারণ সম্পাদক কমল বেরা, সাংগঠনিক সম্পাদক মন্টু মণ্ডল প্রমুখ। কৃষি সমবায় সমিতিগুলির দাবিগুলো হলো— সমবায় সমিতির কর্মচারীদের পে-স্কেল চালু করা এবং তা সরকারের পক্ষ থেকে রূপায়ণ করা। গ্রামীণ জনগণের আর্থিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সরকার নির্ধারিত ডিএসপি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। সমবায় সমিতিগুলিকে দ্বিস্তরীয় কাঠামোয় রূপান্তরিত করতে হবে। গ্রামীণ কৃষি সমবায়গুলিকে ব্যাঙ্কিং ব্যবসার আইনি স্বীকৃতি দিয়ে সর্বস্তরের মানুষের আমানত সংগ্রহের অধিকার দিতে হবে। রাজ্য সরকারের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ গ্রামীণ কৃষি উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে করতে হবে। এদিনকার সভায় এদিন সারা রাজ্যে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নবদ্বীপ-বর্ধমান সড়ক বেহাল, চরম দুর্ভোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৪ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘদিন নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল থাকায় বৃষ্টির জল জমে আছে নবদ্বীপ-বর্ধমান সড়কে। তার উপরে নিম্নচাপের বৃষ্টিতে সড়কটি নদীর আকার নিয়েছে। ফলে এই সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়েছে। ঘটনাটি পূর্বস্থলী ১ ব্লকের সমুদ্রগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মোল্লার বিল নতুনপাড়ায়। খুব সম্প্রতি পূর্বস্থলী-১ ব্লক প্রশাসন বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক সহ প্লাবিত এলাকার মানুষজনকে নিয়ে একটি সভা করেছে। তাতে সিদ্ধান্ত হয়েছে—সড়কের দুপাশে দখল করে বুজিয়ে ফেলা নয়ানজুলি জবরদখল মুক্ত করা হবে। তারপর নয়নজুলি সংস্কার করে জল নিকাশের সুব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

—এরপর চারের পাতায়

এবারে সেরা শারদ সম্ভার নিয়ে প্রকাশিত হবে

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা ২০২১

লিখেছেন : প্রকাশ কারাত, বিমান বসু, মদন ঘোষ, অশোক ধাওলে, শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, অরিন্দম কোঙার, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, তরুণ মজুমদার, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, আভাস রায়চৌধুরী, অরিবিন্দ দাশ, শ্যামল চক্রবর্তী, বিভাস সাহা, রত্না রশিদ ও আরও অনেক নবীন-প্রবীণ লেখকেরা। থাকছে একগুচ্ছ মননশীল কবিতা ও গল্প

মূল্য : ৫০ টাকা

আপনার কপি সুরক্ষিত করতে আপনিও অর্ডার দিন।

নতুন চিঠি

২০ সেপ্টেম্বর, ২০২১

অঙ্গার শতধৌতেন

ভারতের রাজনীতিতে দলত্যাগের ব্যাধি নতুন নয়। স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের প্রতাপ যখন বড় প্রশ্নের সামনে আসেনি, সেই ১৯৬৭ সালে হরিয়ানার গয়ালাল পক্ষকালের মধ্যে তিনবার দলবদল করে ইতিহাসে নাম তুলেছিলেন—যে ঘটনা ভাষাকে উপহার দিয়েছে 'আয়ারাম গয়ারাম' প্রবচনটি। ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার এই দুর্বুদ্ধি নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্রের ভিত দুর্বল করতে পারে। তাই দলত্যাগ বিরোধী আইন লাগু হয় ১৯৫৮ সালে, ২০০৩ সালে তাকে একটু শক্তপোক্ত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু রাজনীতি থেকে যখন নৈতিকতা বিসর্জন দেওয়া হয়, তখন কোনো আইনই কাজে লাগে না। যার সাম্প্রতিক উদাহরণ মুকুল রায় ও তারপর বাবুল সুপ্রিয়র তৃণমূলে যোগদান। যে-কোনো মূল্যে ক্ষমতা অর্জন ও তাকে টিকিয়ে রাখা যখন রাজনীতির লক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হয়, তখন এ জাতীয় অনাচার আর অস্বাভাবিক মনে হয় না।

এ বিষয়ে দুটি প্রশ্ন খুব গভীরে গিয়ে ভাবা দরকার। কেউ কোনো দলের প্রতীকে জয়লাভ করলে তাঁর পক্ষে যাঁরা ভোট দিয়েছেন তাঁদের উপেক্ষা করে নিজের সিদ্ধান্তে দলবদলের অধিকার তাঁর আছে কি না। দলত্যাগের সিদ্ধান্তের পিছনে ব্যক্তিগত লাভালাভ, লেনদেনের প্রশ্ন বাদ দিলেও এই মৌলিক প্রশ্নটা কিছুতেই পাশ কাটানো যায় না। দ্বিতীয়ত, কোনো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি পাঁচিল টপকে নতুন দলে যোগ দিলে তিনি কোন নৈতিকতায় নতুন দলে স্বাগত হতে পারেন। যে বাবুল সুপ্রিয় জ্বালময়ী সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গতকাল ইন্ধন জুগিয়েছেন, 'সংখ্যালঘুর ত্রাতা' তৃণমূল সুপ্রিমো কোন মুখে তাঁকে দলে স্থান দেন? নির্বাচনের সময় মাননীয়া বেড়া-টপকানোদের দলে না ফেরানোর কথা বলেছিলেন। তাহলে কোন নৈতিকতায় বেড়া ভেঙে দেওয়া হল, তাও সেই সমস্ত ধান্দাবাজদের স্থান দিতে যারা নিচ সাম্প্রদায়িক রাজনীতিচর চর্চা করে গতকালও বাংলার বাতাসকে বিষাক্ত করেছেন? তৃণমূলের এক তরুণ মুখ প্রয়োজনে দিদির দরজার সামনে শুয়ে পড়ে এসব নোংরামি আটকানোর কথা বলেছিলেন। তিনি কোথায়? নাকি তৃণমূলের মেশিনের ধোলাই ক্ষমতা ভোটের আগে দেখা বিজেপির মেশিনের চেয়েও বেশি?

আসলে এটা ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে যে শো-রুম দুটো হলেও এ দুদলের গোডাউন একটাই। বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে কেউ কেউ ইভিলের তর-তম খুঁজতে বসেছিলেন। এখন যখন গ্রেটার ইভিল লেসার ইভিলে গিয়ে মেশে তখন গ্রেটার ইভিল লেসার ইভিল নয়, না কি লেসার ইভিল গ্রেটার ইভিল হয়ে যায় সে জবাব তাঁদের দিতে হবে। দুঃখ হয় স্পিকারের অবস্থার কথা ভেবে। সংবিধান বহু আশা করে এই উচ্চপদের মানুষটিকে দলত্যাগের ঘটনার বিচারে দলীয় আনুগত্যের ঊর্ধ্বে উঠে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু তাঁর সে স্বাধীনতা নেই বা থাকলেও স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেবার সাহস নেই। সবাই তো সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় হন না।

জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠশালা চালাচ্ছেন ছাত্র ও মাস্টারমশাইরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ সেপ্টেম্বর : নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বর্ধমান সদর পশ্চিম চক্রের উদ্যোগে মাহিনগর বাগদী পাড়ার মনসাতলায় একটি পাঠশালা চালু হয়। এই পাঠশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শিক্ষক নেতা আব্দুস সালাম মণ্ডল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষকনেতা লক্ষ্মীনারায়ন চক্রবর্তী, কুন্দন ঘোষ প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মানষ ঘোষ। এই পাঠশালা সপ্তাহে ৩দিন চালু থাকবে এবং বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত পাঠশালা খোলা থাকবে। বিদ্যালয়গুলি না খোলে ততদিন পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতে কথা ভেবে বিকল্প পাঠশালা চালু থাকবে। এদিনের অনুষ্ঠানে ৫০ জনের অধিক ছাত্র-ছাত্রী ও ১৫ জন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে পূর্বস্থলীতে খোলা হল পাড়ার পাঠশালা কিশলয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষাব্যবস্থার একটা চরম সংকট দেখা দিয়েছে। সেই সংকট কাটাতেই এদিন কালেখাতলা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঋষি গ্রামে বিকল্প শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে পাঠশালা খোলা হল। এই পাঠশালা নিয়মিত খোলা থাকবে এবং এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা করবে। পাঠশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শিক্ষক সংগঠনের পূর্বস্থলী জোনাল সভাপতি সুদর্শন কোলে। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষকনেতা নীহাররঞ্জন গোস্বামী, কার্তিক দাস, রমা প্রিয় ভট্টাচার্য, রামেশ্বর পাল, যুবনেতা সুমন্ত মুণ্ডারী প্রমুখ। পাঠশালার উদ্বোধনী কালে ৪৬ জন ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত ছিল।

অমানিশার বছর পেরিয়ে কাশ্মীর

অতনু হুই

যন্ত্রনার আড়াই বছর :

দু'বছর অতিক্রান্ত। কাশ্মীরে না মিলেছে কাজ, না গড়া গেছে কোনো নির্বাচিত সরকার। কাশ্মীর সেই তিমিরেই থেকে গেছে। দু'বছর আগে, আগস্ট মাসে আমাদের দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা 'তৃতীয় লৌহ মানব' অমিত শাহ পার্লামেন্টে 'কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল' পেশ করতে গিয়ে অনেকগুলি গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

১) কাশ্মীরকে দ্বিখণ্ডিত করে এবং ৩৭০ ধারা এবং ৩৫/ক ধারা, প্রত্যাহারের মধ্যে দিয়ে বিগত সত্তর বছরে যা হয়নি এবার তা হবে। অর্থাৎ কাশ্মীর মূলভূখণ্ডের গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলের জনস্রোতে মিলে যাবে। ৩৭০ ধার আর বাধা হবে না।

২) কয়েক মাসের মধ্যে নির্বাচন করে সেখানে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

৩) দীর্ঘ বঞ্চিত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের শীঘ্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

৪) লাদাখকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল করে সেখানে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রন বৃদ্ধি করে শীঘ্রই পাক অধিকৃত 'আজাদ কাশ্মীর' ও চীন নিয়ন্ত্রিত 'আকসাই চীন' কে ভারতভূক্ত করা হবে।

৫) কাশ্মীরে জমি, কাজের সুযোগ গোটা দেশের কাছে এবার উন্মুক্ত হবে। বন্ধ হবে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। অতএব এবার উন্নয়নের জোয়ার বইবে।

সেদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে এই হুংকারী ভাষণ আমারা কেউ ভুলিনি। কিন্তু ভুলতে বসেছি হিসাবটা। আসলে কি পেল কাশ্মীর? এই দু'বছরে? দেয় প্রতিশ্রুতিগুলি প্রাপ্তির শূন্যগর্ভতায় ঝিলমের জলে ভেসে যাওয়া ছাড়া কি বা পাওয়ার আছে!

আড়াই বছর ধরে কাশ্মীরে সামরিক শাসন বলবৎ রয়েছে। মূল ভূখণ্ডের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন। ইন্টারনেট পরিষেবা কার্যত বন্ধ। মানুষ গৃহবন্দী। স্কুল, কলেজ, অফিস,আদালত, হাট, বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত। নির্বাচন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দূরে থাক, কাশ্মীরের প্রায় সব রাজনৈতিক দলের সর্বস্তরের নেতারা এখনো হয় জেলবন্দী,নয় গৃহবন্দী। হায় মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে এমনই তথাকথিত একীভূত করা গেছে যে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, স্বরাষ্ট্র বিভাগের পারমিট ব্যতীত নির্বাচিত সাংসদ থেকে সাংবাদিক কাশ্মীরে এখনো সকলের প্রবেশ নিষেধ। সুপ্রিমকোর্টের অর্ডার নিয়ে অসুস্থ সি পি আই (এম) নেতা, (তিন বারের জনপ্রতিনিধি) ইউসুফ তারিগামীকে দিল্লিতে চিকিৎসা করাতে আনতে হয়েছিলো সেদিন সি পি আই (এম) পার্টির সর্বভারতীয় সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিকে। এথেকে সেখানের সাধারণ মানুষের দশা বুঝতে বাকি থাকে না। সাংবাদিকরা পর্যন্ত সেখানে পেশার কাজ স্বাভাবিকভাবে করতে পারছে না। এমনই অবস্থা যে কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা পর্যন্ত বলতে শুরু করেছে-কি পেলাম আমরা? 'এতো এমন হলো, আম ছালা দুই গেলো'। কাশ্মীরকে ঘিরে গড়ে ওঠা গর্বের পর্যটন শিল্প, গালিচা, শাল শিল্প আজ ধ্বংশের পথে।

করোনা মহামারীপর্বে সর্বস্বাচ্ছন্দ সঙ্গে নিয়ে নিছক গৃহবন্দী থাকাটা কত যে যন্ত্রণার এখন যারা বুঝেছি তারা ভাবুন, এই দু'বছরে কাশ্মীরি জনগণের অবস্থা কেমন? লকডাউনে এই ক'মাসে দেশের অর্থনীতি সব যদি ভেঙে পড়তে পারে তবে কাশ্মীরের গত দু'বছরে পরিস্থিতি কি? নিজেকেই প্রশ্ন করুন। কাশ্মীরের মানুষেরা তো ভারতীয়। কাজেই তাদের যন্ত্রণায় আসুন সোচ্চার হই, আর পাঁচটা ঘটনার মত, একজন প্রতিবাদী ভারতীয় হিসাবে।

মনে রাখা প্রয়োজন ''ইতিহাস আমাদের কিছুই শেখায় না। শুধু তার পাঠগুলো নাশেখার জন্য শাস্তি দেয়।'' ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ না করলে তার পরিণাম যে কি হয়, এ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ ভ্যাসিলি ক্লিওয়েভস্কির এই উক্তিটি কাশ্মীর প্রশ্নে যথেষ্ট প্রনিধানযোগ্য। তাছাড়া স্পানিস দার্শনিক জর্জ সানতায়ানার বিখ্যাত সেই কথা—''যারা অতীতকে স্মরণ করেন না তারা এর পুনরাবৃত্তির জন্য নিন্দিত হন''। তাই কাশ্মীর অন্তর্ভুক্তির ইতিহাসকে মনে না রেখে সমস্যার সমাধান খোঁজার পরিণতি দেশের পক্ষে স্বাস্থ্যকর পূর্বেও হয়নি ভবিষ্যতেও হবে না।

নেহেরুর স্বাধীনতার স্বপ্ন :

''আমরা কি সেই বিশ্বাস করি এমন এক জাতি রাষ্ট্রে যেখানে সব ধর্মের, সব মতের লোকের ঠাঁই আছে এবং যা মূলত ধর্মনিরপেক্ষ? নাকি এক ধর্মীয় এবং ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণায়, যা অন্য ধর্মে বিশ্বাসী লোককে আপন আওতার বাইরে রাখে? প্রশ্নটা খুব অদ্ভুত কারণ কয়েকশো বছর আগেই দুনিয়া ধর্মীয় বা ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণাটিকে ত্যাগ করেছে। আধুনিক মানুষের মনে এ প্রশ্নের কোন জায়গাই নেই। অথচ আজকের ভারতে প্রশ্নটা তুলতেই হচ্ছে, কেননা আমাদের মধ্যে অনেকেই উল্টো মুখে লাফ দিয়ে পুরোনো যুগে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছে''।

—এই কথাগুলি দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু সেই সময়ে বলেছেলেন যখন সদ্য স্বাধীন ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠেছে, তার সংবিধানকে সম্বল করে। হয়ে উঠতে চাইছে—সর্বধর্ম, সর্বজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার এক পীঠস্থান। গড়ে তুলতে চাইছে সাংবিধানিক এমন এক বোধ যা সর্বদা মনে করায় বলপ্রয়োগ নয়, আলাপ আলোচনাই রাজন্যশাসিত রাজ্য সমূহের অন্তর্ভুক্তির একমাত্র জিয়নকাঠি হতে পারে।

কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পটভূমি :

নেহেরু নিজে ছিলেন একজন কাশ্মীরি পণ্ডিত। তাই কাশ্মীর নিয়ে তাঁর আলাদা দুর্বলতা থাকাটাই স্বাভাবিক। দেশীয় রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভ ভাই প্যাটেল তার দপ্তরের সচিব-ভি পি মেনন এবং আয়েঙ্গারকে সব দায়িত্ব দিয়ে নেহেরু ভারমুক্ত থাকতে চেয়েছিলেন।

কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান তবু কাশ্মীর ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে থাকুক এটাই ছিল তার প্রথম মনোবাসনা। এছাড়া কাশ্মীরের মুসলমান মানুষের অবিসংবাদিত নেতা শেখ আব্দুল্লাহ ছিলেন তার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজনেই কাশ্মীর নিয়ে সমভাবিত ছিলেন। এক কাশ্মীরি পণ্ডিত, আর এক কাশ্মীরি মুসলমানের একই মনোভাবের পিছনে ছিল উভয়েরই মতাদর্শগত ভাবে সমাজতন্ত্রিক মানবতার প্রতি আস্থা। বরং বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রথমদিকের মনে করতেন কাশ্মীর পাকিস্তানেরই প্রাপ্য। কিন্তু ওই 'লৌহ মানব'! কাশ্মীরের ভারতভুক্তির প্রশ্নে দৃঢ় মনোভাব গড়ে তুললেন, যখন জুনাগড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটি সামনে চলে আসলো। সে এক সংকটময়কাল। চাপের রাজনীতি এবং পাপের পরিণতির এক সংকটময় স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হবার সময় তিনটি দেশীয় রাজ্য ভারতভুক্ত না হয়ে স্বাধীন থেকে যায়। এগুলি হল জুনাগড়, হায়দ্রাবাদ এবং কাশ্মীর। যদি মানচিত্র পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে ব্রিটিশরা ভারতকে দ্বিখণ্ডিত নয়, ত্রিখণ্ডিত করেছিল। তারা আমাদের যে স্বাধীনতা দিয়ে যায় তাতে ভারত, পাকিস্তানের সঙ্গে রাজন্য শাসিত ৮৮৫ টি রাজ্যের আয়তন তুলনা করলে দেখা যাবে তা ছিল ভারতের আয়তনের প্রায় প্রায় কুড়ি ভাগ। দশ বারোটি গ্রাম নিয়ে যেমন দেশীয় রাজ্য ছিল তেমনি দেশীয় রাজ্য হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীর ইউরোপের বহু দেশের থেকে আয়তনে বড় ছিল।

গুজরাটের কাছে কাথিয়াবাড় অঞ্চলে জুনাগড় রাজ্যটি করাচি বন্দরের নিকটবর্তী ছিল। সেখানকার শাসক ছিলেন মুসলমান। তিনি ভারতে নয় পাকাপাকি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে মনস্থির করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জিন্না এতে প্রত্যক্ষ মদত দেন। নিজের জন্মভূমি গুজরাট রাজ্যের, নিজ বাসস্থান অঞ্চলের এই পরিণতিতে প্যাটেল কিছুটা হতোদ্যম হয়ে পরেন। তাই যে কোন শর্তে জুনাগড়কে ভারতভুক্ত করতে না পারলে তাঁর 'লৌহমানব' ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হবে। অতয়েব যেকোন মূল্যে একাজ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু জুনাগড়ের নবাব চাপের কাছে বাধ্য নাহলে, প্যাটেল দাবি তোলেন জুনাগড়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যেহেতু হিন্দু অতএব তাদের মতামতেই জুনাগড়ের ভবিষ্যৎ ঠিক হোক। অবশেষে প্রায় ৯২ শতাংশ মানুষের সম্মতিতে এক গণভোটের মাধ্যমে জুনাগড় ভারতভুক্ত হয়।

জুনাগড় নিয়ে টানাটানি চলাকালীনই প্যাটেল বুঝেছিলেন জিন্নাকে পাল্টা চাপে রাখতে হবে। তিনি তাই তখন চাপের রাজনীতি করতে গিয়ে দাবী করেন কাশ্মীরের রাজা হরি সিং যেহেতু হিন্দু, অতএব কাশ্মীর ভারতের হবে। তখন কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে মুসলনান জুনাগড়ে ভারতভুক্ত করতে যে প্রশ্ন তিনি তুলেছিলেন, তা তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন। কিন্তু পাশার দান উল্টে যায় দুটি কারণে। প্রথমতঃ হরি সিং এর প্রধানমন্ত্রী-রামচন্দ্র কাক রাজাকে বোঝালেন—ভূস্বর্গ কাশ্মীর স্বাধীন রাজ্য হিসাবে থাকাটাই ভালো এবং তা হবে 'প্রাচ্যের সুইজারল্যাণ্ড'। পৃথিবীর এক নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে কাশ্মীর গড়ে উঠবে, এই স্বপ্ন হরি সিং স্বয়ং দেখতে শুরু করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগণ প্রথম থেকে পাকিস্তানে যেতে কখনোই চায়নি। ইসলামিক রাষ্ট্র অপেক্ষা তারা অধিক ভাবিত ছিল- নিজস্ব 'কাশ্মীরিয়ত্' ভাবনায়, (কাশ্মীরের নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাবনা) ও তা রক্ষার প্রশ্নটিতে।

এদিকে দেশ ভাগের পরেপরেই কাশ্মীরি মুসলমানরা কেন পাকিস্তানে যাচ্ছে না। তারা চলে গেলে তাদের জমি, বাড়ি, সম্পদ সবই লুট করা যাবে এই ভেবে কাশ্মীরের হিন্দু রাজার পারিষদবৃন্দ তীব্র দাঙ্গার পরিবেশ তৈরি করে। এতে পাঁচ লক্ষের বেশি সাধারণ গরিব মুসলমান মানুষকে হত্যা করা হয়। এর পরে পরেই পাক হানাদারদের আক্রমণ শুরু হয় এবং প্রাণভয়ে হরি সিং ও তাঁর মোসাহেবরা শ্রীনগর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে ভারত সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কাজেই তখনকার সেই পরিস্থিতিতে হরি সিংএর পক্ষে ভারতভুক্ত হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা খোলা ছিল না।

নেহেরুর কাশ্মীর ভাবনা :

নেহেরু কিন্তু সর্বদা চেয়েছিলেন বাধ্যবাধকতাহীন এক মিষ্টি পরিবেশে কাশ্মীর ভারতভুক্ত হোক শুধুমাত্র

—এরপর তিনের পাতায়

অমানিশার বছর পেরিয়ে কাশ্মীর

—দুয়ের পাতার পর

কাশ্মীরি জনগণের শুভেচ্ছাকে পাথেয় করে। তিনি ভারতীয় মিলিটারির জুতোর তলায় কিংবা বন্দুকের নলের সামনে কাশ্মীরের মানুষের স্বাধীনসত্ত্বা যেন ভূলুণ্ঠিত নাহয় তা সর্বদা কামনা করতেন। কাশ্মীরি জনগণকে প্রচণ্ড দুঃখ দুর্দশার মধ্যে ফেলে দিয়ে ভারত পাকিস্তান তাদের রাজনৈতিক যুদ্ধ চালিয়ে যাবে তা তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। এক চিঠিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেহেরু হরিসিংকে কাশ্মীর প্রসঙ্গে কি কি বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে তার পরামর্শ লিখে জানিয়েছিলেন।

প্রথমতঃ একটি গণভোট করে কাশ্মীরের জনগণকে কোন দেশে তারা যোগ দিতে চায় তা নির্ণয় করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, রাজ্যটির স্বাধীন সত্ত্বা বজায় থাকবে এবং ভারত ও পাকিস্তান তার প্রতিরক্ষা নিশ্চয়তা দেবে। তৃতীয়ত, রাজ্যটিকে ভাগাভাগি করা। এবং জম্মু চলে আসবে ভারতে বাকি অংশ পাকিস্তানে। চতুর্থত, জম্মু-কাশ্মীর উপত্যকা ভারতের সঙ্গে থাকবে এবং পুঞ্চ সহ অন্যান্য অংশটি চলে যাবে ওপারে।

শেষমেশ নেহেরু চেয়েছিলেন কাশ্মীর ভারতেরই থাক। তাঁর এই ইচ্ছাকে সাহস জুগিয়েছিলেন সেখ আবদুল্লা। উভয়েই আশ্বস্ত ছিলেন সরাসরি ভারতীয় সংঘের মধ্যে থাকলে কাশ্মীরের পাকাপাকি ভবিষ্যত একটা ব্যবস্থা করা যাবে। উভয়েই বুঝেছিলেন কিছুকাল সেনাবাহিনী দিয়ে এসব রক্ষাকরা সম্ভব কিন্তু দীর্ঘকাল সেনাবাহিনী রাখলে এর বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিক্রিয়া সামলানো কঠিন হবে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে সাধারণ একজন মুসলমান যদি ভাবে ভারতীয় সংঘ তার পক্ষে নিশ্চিত নিরাপদ নয় তাহলে সে অন্যদিকে চলে যাবেই। তাই ধৈর্য্য, নমনীয়তাই হবে একমাত্র পলিসি। এবং দুজনেই বুঝেছিলেন এসব ঠিক করতে হবে উভয় পক্ষের স্বাভিমানকে অক্ষুন্ন রেখেই। সম মর্যাদায়।

শেখ আব্দুল্লার কাশ্মীর :

তবে মনে রাখা প্রয়োজন, কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনতা শেখ আব্দুল্লাহ নেতৃত্বে প্রথম থেকেই জানিয়ে দেয় তারা ভারতভুক্ত হবে কিনা তা পরে ভাববে। কিন্তু তারা কখনোই পাকিস্তানের সঙ্গে যাবে না। যার পরিণতিতে পাক মদতপুষ্ট হানাদারদের সঙ্গে আত্মরক্ষার কঠিন লড়াই লড়তে হয়েছে 'শের ই কাশ্মীর' শেখ আব্দুল্লাহের নেতৃত্বে কাশ্মীরের সাধারণ মুসলমান মানুষকে। আর তখনই প্রজাদের ফেলে রাজা হরি সিং শ্রীনগর থেকে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে সোনাদানা বউ বাচ্চাদের নিয়ে পালিয়ে গেছেন জম্মুতে। আর শেখ তখন ভারতীয় বাহিনী পৌঁছানোর বহু আগে থেকেই দুই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। একদিকে পাক শত্রু হানাদারদের মোকাবিলা করা আর অন্যদিকে রাজার বশংবদ সকল পারিষদদের জমি কেড়ে নিয়ে গরিব মুসলমান চাষিদের মধ্যে বিলিবন্টন করে দেওয়া। এই দুটি কাজ শেখ আব্দুল্লাহকে কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতায় পরিণত করে।

এর বহু পূর্বে রাজার সৈন্যদের হাতে জমির লড়াইএ নিহত গরিব কৃষকদের মৃত্যুকে স্মরণ করে লাল পতাকা আর তার উপর লাঙল চিহ্ন সম্বলিত পতাকা উড়িয়েছেন তিনি। একদিকে শহিদ, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশে সেই পতাকা উর্ধ্বে তুলে নেয় কাশ্মীরের মানুষ। প্যাটেল সহ তাঁর দলবল তখন হরি সিংকে শেখের এবং কমিউনিজমের ভয় দেখিয়ে ভারত ইউনিয়নে যুক্ত হতে রাজি করান। এদেশে শাসকশ্রেণির কমিউনিজমের ভয় কতোটা মারাত্মক ছিলো বোঝা যায়, যখন হায়দ্রাবাদের নিজামকে প্যাটেলের পক্ষ থেকে বলা হলো- তেলেঙ্গানা গণসংগ্রামের সাফল্যে কমিউনিস্টরা নিজামশাহীর সবকিছু দখল করে নেবে। নবাববাড়ি, রাজত্ব, সম্পদ সবই কমিউনিস্টরা কেড়ে নেবে। তাই ভারতে যোগ দাও। এতে রাজত্বটা গেলেও নবাবিয়ানাটা অন্ততঃ বাঁচবে। উল্টোদিকে সেনা পাঠিয়ে রক্তক্ষয়ী ভীতির দ্বিমুখী ভীতির পরিবেশ তৈরি করে কার্যত হায়দ্রাবাদেকে বাধ্য করা হয়েছিল ভারতভুক্ত হতে। তেমনি হরি সিংকে বলা হয়েছিলো শেখকে ম্যানেজ করে চলতে। নইলে রাজপাট, ভূস্বর্গ সবই হাতছাড়া হয়ে যাবে সেটা বোঝানো হয়েছিল।

গণপরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ :

সংবিধান রচনাকালে ভারতীয় গণপরিষদের সভায় রাজা হরি সিং প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে কাশ্মীরের জনগণের নেতা শেখ আব্দুল্লাহ সহ চারজনকে প্রেরণ করেন। কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে গণপরিষদে প্রতিনিধিদের মতামতকেই মেনে নিতে রাজি হওয়া ছাড়া হরি সিং-এর সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিলনা। তাঁর 'স্বপ্নের সুইজারল্যান্ডের' এখানেই যবনিকাপাত ঘটে। ভারতীয় গণপরিষদে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা শেষে জন্ম হয় ৩৭০ ধারার। ওই সংবিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন স্বয়ং বল্লভ ভাই প্যাটেল, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সকলেই কিছু সুযোগের বিনিময়ে কাশ্মীর ভারতীয় রাজ্য হয়ে উঠুক এটাই কামনা করেছিলেন। এই চাওয়া কিন্তু অমূলক ছিল না। বরং সেতুবন্ধন হিসাবে ৩৭০ ধারা ভারত ও কাশ্মীরকে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জুড়েছিলো। আজ সেই সেতু নাড়িয়ে দিয়ে,দুলিয়ে দিয়ে, যারা আনন্দে আত্মহারা তাদের সর্বাগ্রে এর পরিণতি কী হতে পারে তা বোঝার জন্য দীর্ঘ ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

রাষ্ট্রসংঘে কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপন :

যখন কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির এসব প্রক্রিয়া চলেছে তখন মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে ভারতই প্রথম ১৯৪৮ সালের পয়লা জানুয়ারি রাষ্ট্রসঙ্ঘে কাশ্মীর সমস্যাকে নিয়ে হাজির হয়। কাশ্মীর ভারতের অংশ, অধিকৃত কাশ্মীর অংশ থেকে পাকিস্তানি সৈন্য সরে যাক এটাই ছিল ভারতীয়দের দাবি। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে পাল্টা কাশ্মীরি মুসলমানদের উপর গণহত্যা সংগঠিত করার প্রশ্ন তুলে এবং সেখানে নিরাপত্তার প্রশ্নে পাকিস্তানের দায়িত্বের প্রসঙ্গটি জোরালো ভাবে উত্থাপিত করা হয়। ফলে নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনা সূচিতে 'জম্মু কাশ্মীর সমস্যা'-র বদলে তা লেখা হয়েগেল 'ভারত-পাকিস্তান সমস্যা'। সম্ভবতঃ সেদিন থেকে ভারতে তাৎপর্যপূর্ণ পরাজয় সূচনা ঘটালো। তখনই সামনে এলো দুই দেশের সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টি। তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরে সাধারণ মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দেবার প্রশ্নটি। আজ সময়ের দীর্ঘ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সেদিন ভারতের পক্ষে এ প্রসঙ্গ তোলা উচিত হয়েছিলো কিনা এই প্রশ্ন সহজে তোলা যায় কিন্তু যে ভবিতব্য ঘটে গেছে, তা বহন করে চলতে হয়েছে সমগ্রদেশকে তা অগ্রাহ্য করা কি সম্ভব?

গহনাহীন 'গহনার বাক্স' :

যা হোক এরপর ঝিলাম নদী দিয়ে বহুকাল রক্তরঞ্জিত জল বয়ে গিয়েছে। বিষয়টি 'দুটি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়' বলে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ বারংবার এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ভারতের সংবিধানের অস্থায়ী হিসাবে থাকা ৩৭০ ধারা কাশ্মীরের নিজস্ব সংবিধান দ্বারা অনুমোদিত হবার পর স্থায়ী ধারায় পরিণত হয়েছে। দিল্লি চুক্তির দ্বারা রাজা হরি সিং ১৯২৭ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে যেসব আইন রাজ্যে বলবৎ করেছিলেন, ওই রাজ্যের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দিতে, সেই দাবিগুলিকে (কাশ্মীর রাজ্যে চাকুরি পাবে কাশ্মীরি মানুষ, বাইরে থেকে কেউ এসে জমি কিনতে পারবে না ইত্যাদি) ৩৭০ ধারা অংশ হিসেবে ৩৫/ক উপধারায় তা যুক্ত হয়েছে। কিন্তু ক্রমে ১৯৫৪ সালে কাশ্মীরকে সম্পূর্ণ ভারতীয় সংবিধানের আওতায় নিয়ে নেওয়া হয়েছে। এমন কি সেখানকার রাজ্যের চুক্তিকৃত আইনের তোয়াক্কা না করে, গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখিয়ে ১৯৬৪ সালে কাশ্মীরে ৩৫৬ ধারা জারি করে সেখানকার রাজ্য সরকারকে ফেলে দেওয়ার অধিকার স্বয়ং রাষ্ট্রপতি হাতে তুলে নিয়েছেন। অর্থাৎ ক্রমশ ৩৭০ ধারাটি একটি 'গহনার বাক্সে' পরিণত হয়েছে। কোন গহনা নাই কিন্তু গহনা যে ছিল তার অহংকার আছে। আর আছে কেবল দুই পক্ষের স্বাভিমান। ভারত ও পাকিস্তানের কাছে কাশ্মীর 'স্পেনীয় ক্ষতের' মতো। প্রথমদিন থেকে যন্ত্রণাদায়ক থেকে গেছে। দীর্ঘ ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার এক বোকাবোকা প্রয়াসে বারংবার সার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে কাশ্মীরের স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নটিকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। আর ক্ষমতার যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ। যে অজুহাতে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করা হলো অথচ ভাবা হলো না ৩৭১ ধারায় ১১টি ভারতীয় রাজ্য সেই একই সুযোগ সুবিধা পায়। ঐ রাজ্যগুলির ভারতে একইভাবে অন্তর্ভুক্ত হবার শর্ত হিসাবে যা সংবিধানে গৃহীত হয়েছে। কাশ্মীরের পৃথক পতাকা, যে ঐতিহাসিক কারণে তার জন্ম হয়েছিলো তাকে যদি স্মরণে রাখতে পারতাম তাহলে বিজেপি শাসিত কর্ণাটক এবং মিজোরাম উভয় রাজ্যের পৃথক পতাকা কেন, বিষয়টি একইরকম ভাবে বুঝতে আমাদের অসুবিধা হবার কথা না।

কাশ্মীরের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব :

শেষে একটি কথা মনে রাখতে হবে, এই উপমহাদেশে কাশ্মীরের ভৌগোলিক অবস্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে পাকিস্তান অপরদিকে কয়েক কিলোমিটার দূরে আফগানিস্তানের পথ পার হলেই রাশিয়া। আবার উত্তর-পূর্ব দিকে শক্তিশালী চীন। এরকম বহু দেশের সীমান্ত লাগোয়া একটি অঞ্চলের জনগণের মনোভাবকে দেশের অনুকূলে রাখা ভূরাজনৈতিক ভাবে খুবই প্রয়োজন। কার্গিল যুদ্ধ বা আগের ভারত-পাক যুদ্ধগুলিতে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ পাশে না থাকলে ভারতকে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। কিন্তু তারা পাশে ছিলো। রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা ব্যতীত নিছক সামরিক পথে যদি দখল সম্ভব হতো তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারকে পরাজিত হতে হতো না। আফগানিস্তান, ইরাক থেকে মার্কিন সেনাদের সেখানকার প্রকৃত সমস্যা না মিটিয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যাওয়া আমাদের দেখতে হতো না। এটা তো মানতেই হবে মাত্র ৬৭ দিনের জন্য হলেও স্বাধীন থাকার পরেই কিন্তু কাশ্মীর ভারতভুক্ত হয়েছে। ভারতের মতো একইভাবে কাশ্মীর তার স্বাধীনতার স্বীকৃতি লাভ করেছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 'ভারতের স্বাধীনতা আইন' অনুমোদনের মাধ্যমে। যেখানে দেশীয় রাজ্যগুলিকে স্বাধীন থাকার বা ভারত, পাকিস্তান যেকোন দেশের সঙ্গে যুক্ত হবার আইনি অধিকার তাদের দেওয়া হয়। তাই সংবিধানের ৩৭০ ধারা কাশ্মীরের ভারতভুক্তির অপরিত্যাজ্য মহান এক রক্ষাকবচ।

আফিম যুদ্ধে পরাজয়ের পর চীনের রাজা হংকং বন্দরকে ৯৯ বছরের জন্য ইংল্যান্ডের হাতে লিজ হিসেবে তুলে দিয়েছিলো। ইতিহাসের নির্মম সত্য বহু টানাপোড়েনের পর ১৯৯৭ সালে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক চীনকে ইংল্যান্ড সেই দ্বীপরাষ্ট্র ফেরত দিতে বাধ্য হয়। স্বয়ং ইংল্যান্ড বা অন্য কোন দেশ ইংল্যান্ডের পক্ষে দাঁড়িয়ে চিনের দাবী অন্যায্য বলে আন্তর্জাতিক আইনকে লঙ্ঘন করতে সাহস দেখাতে পারেনি। তাই ভারতের আজকের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি তথা 'কাশ্মীর ইস্যু'—পাকিস্তান, চীন কিংবা বাংলাদেশ বা নেপালকে প্রভাবিত করতে পারে কিন্তু কাশ্মীরের মুসলমান মানুষ বিপন্ন, সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত এই দাবি মুসলিম জনমানসে ও আন্তর্জাতিক মৌলবাদী শক্তির মাধ্যমে একান্নটি মুসলিম দেশসহ গোটা বিশ্বে যদি ক্রমশ ইস্যু হয়, তাহলে কার্যত গোটা মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আফ্রিকা মহাদেশকে তা গভীরভাবে প্রভাবিত করবে। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রসংঘে কাশ্মীর ও তার সীমান্ত অঞ্চলের বিষয়গুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

কাশ্মীর আপেল নয় :

তাই ভাবা প্রয়োজন, আরো গভীরে গিয়ে। বিভাজনের এই রাজনীতি ভারতীয় গণতন্ত্রে বিপদ ডাকবে নাতো!? আত্মঘাতী এই রাজনীতি দেশবাসীকে শেষে একটি সামরিক রাষ্ট্রের অধীনে স্বাধীনতাহীন হয়ে থাকতে বাধ্য করবে নাতো?! ভূস্বর্গ কাশ্মীর আরেকটা গাজা ভূখণ্ডের মতো নরকে পরিণত হবে নাতো!? ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। এটা আমাদের কাছে যথেষ্ট গর্বের। এটাও ঠিক কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থেকেই কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে পথ খোঁজা প্রয়োজন, যেখানে কাশ্মীরের মানুষের মতামত সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পাবে। তা না করে একতরফা কাশ্মীরকে নরম আপেলের মতো যেমন খুশি ফালাফালা করা যাবে ভাবলে তা হবে চরম ভুল। যে মাটিতে আপেল হয় সে মাটিতেই শক্ত আখরোট জন্মায়। তাই নয় কি??

কাশ্মীর- হিন্দুত্ববাদীদের এক পরীক্ষাগার :

আর এস এস পরিচালিত বি জে পি সরকার চাইছে স্বাধীনতার স্বপ্নলালিত সোপানগুলিকে অস্বীকার করতে। আমাদের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার, বিদেশনীতির দীর্ঘ ঐতিহ্য সব ভুলিয়ে দিতে। স্বাধীনতাযুদ্ধে তাদের বেইমানির কালো ইতিহাস ভুলিয়ে ইতিহাসের নবনির্মান করে, জনমনে সর্বদা প্রাসঙ্গিক থাকতে চাইছে তারা। বিদেশনীতি, কাশ্মীরনীতি এসবকেই নির্বচনী ইস্যুকরে ভোট বৈতরণী পার হতে চাইছে তারা। প্রয়োজনে মানুষ, তার অধিকার, গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে যূপকাষ্ঠে বলিদিতে তারা পিছপা নয়। কাশ্মীরি মানুষকে জব্দ করে আদপে হিন্দুত্ববাদী উচ্ছাসকে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতার খাতে বইয়ে দিয়ে আপাত লাভ ঘরে তুলতে চাইছে তারা। দেশের ভবিষ্যতের বিপদজনক পরিণামের কথা না ভেবেই চলেছে এসব। ফের লাদাখ সীমান্তে যুদ্ধযুদ্ধ খেলা শুরু হয়েছে। প্রতিবেশীদেশগুলির সঙ্গে সীমান্ত মানচিত্র নিয়ে অবিশ্বাসের কালোছায়া ভারতকে বন্ধুহীন করে তুলছে ক্রমশ। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশের ভিতর দমনপীড়ন ও এককেন্দ্রিক সামরিকশাসন বলবতের রাস্তা পরিস্কার করে তুলতে চাইছে তারা। কাশ্মীরের নেতাদের ডেকে এনে একতরফাভাবে ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে 'ভোট করা হবে'। মর্জিমাফিক শুরু হয়েছে নির্বাচনী ক্ষেত্র পুনর্বিন্যাসের কাজ। হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা মাথায় রেখে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। যাতে নিজভূমে পরবাসী করে রাখা যায় কাশ্মীরীদের। হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডাগুলি কার্যকরী করে তুলে ভারতীয় দেশজুড়ে ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে অবলীলায়। বিগত কয়েক বছর ধরে কাশ্মীরের ঘটনাক্রম সেই অ্যাজেন্ডারই আরেক পরীক্ষাগার।

নিধিরামদের পার্থনিয়াম নাশ অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ১৯ সেপ্টেম্বর : মন্তেশ্বরের মাঝেরগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শুরু হলো পার্থনিয়াম নাশ অভিযান। এই অভিযান চলবে এক সপ্তাহ ধরে। আর এই অভিযানে নেমেছেন পশ্চিমবঙ্গের নিধিরাম সর্দাররা। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই এ যেন এক একজন নিধিরাম সর্দার। পশ্চিমবঙ্গে এই রকম নিধিরাম সর্দারের সংখ্যা পঁচিশ হাজার। যদিও রাজ্য সরকারের দেওয়া এদের পোশাকি নাম ভিআরপি বাংলায় বলা হয় গ্রামীণ সম্পদ কর্মী। এই করোনা আবহে সংকটজনক পরিস্থিতিতে সমস্ত মানুষ যখন ভয়ে ঘরবন্দি, সেই সময় সারা বাংলা জুড়ে এরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ডেঙ্গির বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে। এদের না আছে ভয় ডর, না আছে কোন রকম সুরক্ষা কবচ। অতি সামান্য ভাতায় তারা কর্তব্যপালনে অবিচল। সেই ছবিই শনিবার দেখা যায় মন্তেশ্বর ব্লকের মাঝেরগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এই এলাকার গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা ভিসিডি কর্মীদের সাথে নিয়ে ডেঙ্গি ছাড়াও আরেকটি বাড়তি দায়িত্ব পালন করছেন। বিভিন্ন রাস্তার পাশ দিয়ে গজিয়ে উঠেছে বিষাক্ত পার্থনিয়াম আগাছা। এই আগাছা মানুষের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। মানুষের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে গ্রামীণ সম্পদ কর্মী ও ভিসিডি কর্মীরা যৌথভাবে পার্থনিয়াম নাশ অভিযান শুরু করেছেন শনিবার থেকে। তারা পার্থনিয়াম আগাছার উপর নুনের জল স্প্রে করছেন। গ্রামীন সম্পদ কর্মীর সুপারভাইজার প্রিয়া রায় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এই অভিযান চলছে। তিনি বলেন, নুন জল স্প্রে করলেই এই আগাছা ধ্বংস হবে। তিনি জানান—ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধ ও মানুষের জন্য কল্যাণকর অভিযান আমাদের জারি থাকবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন গ্রামীন সম্পদকর্মী জানান—আমাদের ন্যূনতম প্রাপ্যটুকুও সময়ে মিলছে না। এমনকি আমরা ডেঙ্গুর মতো রোগের বিরুদ্ধে তৃণমূল স্তরে গিয়ে লড়াই করছি। মানুষের জন্য কল্যাণকর অভিযান চালাচ্ছি। সেই স্বীকৃতিটুকুও আজ আমাদের কাছে অধরা।

ফরিয়াদ মুন্সীকে স্মরণ খণ্ডঘোষে

নিজস্ব সংবাদদাতা, খণ্ডঘোষ : খণ্ডঘোষ-১ এরিয়া কমিটির সদস্য ফরিয়াদ মুন্সির স্মরণ সভা সিপিআই(এম) খণ্ডঘোষ অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন অপূর্ব চ্যাটার্জী, দেশবন্ধু হাজরা, বিনোদ ঘোষ আসগর মণ্ডল এবং এলাকার মানুষজন। তার স্মৃতিচারণা করেন আসগর মণ্ডল, বিনোদ ঘোষ, অপূর্ব চ্যাটার্জি, সভাপতিত্ব করেন কমরেড দেশবন্ধু হাজরা। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন উত্তম কর্মকার। এলাকার অগণিত মানুষ ফরিয়াদকে শেষ শ্রদ্ধা জানায়।

বর্ধমান পুরসভায় নতুন অ্যাপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর, বর্ধমান : তিন বছর ধরে বর্ধমান পুরসভায় পুরবোর্ড না থাকার কারণে নাগরিকদের পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। এবার অভাব, অভিযোগ থাকলেই হাতের মুঠোয় তাড়াতাড়ি সমাধান। বর্ধমান পুরসভা নাগরিক পরিষেবায় নতুন অ্যাপ আনলো, যার মাধ্যমে সহজেই মিলবে বিভিন্ন অভিযোগের সমাধান সূত্র। থাকছে অভিযোগ জানানোর নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মোবাইল অ্যাপে অভিযোগ জানালে দ্রুত তা খতিয়ে দেখে মানুষের পরিষেবা দেবে বর্ধমান পুরসভার কর্তৃপক্ষ। এদিন বর্ধমান পুরসভার সভাকক্ষে অভিনব এই অ্যাপের উদ্বোধন করেন পুর প্রশাসক মণ্ডলীর সভাপতি প্রণব চ্যাটার্জী।

শহীদ স্মরণে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ সেপ্টেম্বর : ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কালনা ২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে বুধবার শহিদ অলি আহম্মদ খান, জামাল উদ্দিন, খ্যাদা মুড়া স্মরনে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ময়নাগুড়িতে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে ৩০ জন যুবক-যুবতী স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। এই শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি স্বর্ণেন্দু দাস। উপহার হিসেবে প্রত্যেক রক্তদাতার হাতে বৃক্ষশিশু তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য ১৯৯০ সালের ১৬ সেপ্টম্বর শহিদ হন কৃষক নেতা অলি আহম্মদ খান এবং তার আগে শহীদ হন খাঁদা মুড়া, শেখ জামালউদ্দিন।

সুনীতি ঘোষ-এর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : আজ দুপুর দুটো নাগাদ ভাতছালা এলাকার প্রবীণ সিপিআই(এম) দরদী সুনীতি কুমার ঘোষ স্বল্প রোগভোগের পরে প্রয়াত হন। সুনীতি কুমার ঘোষ ছিলেন সিপিআই(এম) নেতা মদন ঘোষ-এর সেজ ভাই। সমগ্র পরিবারের সঙ্গে প্রয়াত ঘোষও বামপন্থী স্রোতধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রয়াত ঘোষের মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান মদন ঘোষ, সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, তরুণ রায়, মহবুব আলম, গৌরী ব্যানার্জী, তাপস ব্যানার্জী সহ অসংখ্য নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ। পরে বর্ধমানের নির্মল ঝিল শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর স্ত্রী ও পুত্র ও কন্যা বর্তমান।

সেখ হেদায়েত আলী-এর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : বর্ধমান সদর-১ এরিয়া কমিটির মাটিয়াল গ্রামের সিপিআই(এম) সদস্য সেখ হেদায়েত আলী (৫৫) আজ ভোর ৪টায় বর্ধমানে এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান। ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ১০ বছর বেলকাশ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ছিলেন। সরকার পরিবর্তনের পর মিথ্যা মামলায় তাকে জেল খাটতে হয়। তাঁর উপর তৃণমূল কংগ্রেস শারীরিক নির্যাতন করে। নানা আক্রমণ ও চাপের কাছে কখনো মাথানত করেননি। আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে নিষ্ঠার সাথেই গরিব ও মেহনতি মানুষের স্বার্থে কাজ করে গেছেন। তার স্ত্রীও তিনকন্যা, মা বর্তমান। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে বর্ধমান সদর-১ এরিয়া কমিটির সদস্যগণ, এলাকার পার্টি সদস্য সহ অগণিত মানুষ তাঁর মরদেহে ফুলের মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

কবি ও নাট্যকার অলোক সামন্তকে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : কবি নাট্যকার শিক্ষক অলোক সামন্তর স্মরণসভা হয়ে গেল এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। আজ বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারে সাহিত্যসভা আয়োজিত এই স্মরণসভায় প্রকাশিত তাঁর কবিতা ও জীবনকথা সম্বলিত একটি ফোল্ডার। 'সাহিত্য সভা'র পরিচালনায় তাঁর ভূমিকার কথা আলোচনা করেন জমর সাহানী। তাঁর স্মরণে কবিরা কবিতা পাঠ হয় এবং আলোচনা করেন দেবাশীষ মহান্তী প্রমুখ।

—প্রথম পাতার পর

সড়ক বেহাল, চরম দুর্ভোগ

কাজের কোন অগ্রগতি হয়নি। সড়কের মাঝে তৈরি হওয়া বিরাট খানাখন্দে দুই এক গাড়ি পাথর পড়েছে বটে, কিন্তু সড়কের হাল ফেরেনি। বর্ধমান থেকে সরাসরি নদীয়ার কৃষ্ণনগরের সঙ্গে যোগাযোগ করার একমাত্র সহজ সড়কটি হল—বর্ধমান নবদ্বীপ ভায়া নাদনঘাট সড়ক। ফলে এই সড়কের উপর খুবই চাপ আছে। তাই দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে এই সড়কটি সংস্কার করা খুবই জরুরী বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞ মহল।

প্রান্তজন—আত্মজন (২২)

রত্না রশীদ

একদিন সকালে আমরা জলখাবার খেয়ে খেলতে যাবো বলে তৈরি হচ্ছি, এক সাধুবাবা খড়ম ঠক্ ঠক্ করতে করতে বাড়ির ভেতরে ঢুকে এলো। ...কে রে বাবা এটা! কেমন ধোঁয়াটে কাঁচের একটা চশমা চোখে, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে মুখের নাক আর ঠোঁটটা ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না। জামা ধুতি সব কটকটে গেরুয়া। বিশাল দশাসই চেহারা। হাতে জড়ানো অনেকগুলো পাক খাওয়া মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। গলা থেকে পেট পর্যন্ত বিরাট লম্বা রুদ্রাক্ষের তিন তিনটে মালা, ডান হাতে কমণ্ডলু আর দশটা আঙুলে আঙুলে গোটা পনেরো কী সব পাথরের আংটি...। আমার মেজোভাই তো ভয়ে একছুটে শোবার ঘরের খাটের নিচে ঢুকে গেল। আর ছোট ভাই কাঁদতে কাঁদতে প্যান্টে হিসি করে ফেললো। আর আমরা পিঠোপিঠি দু-ভাইবোন হতভম্ব। এটা কে এলো রে বাবা বাড়ির ভেতর!

আমাদের বাড়িতে শুধু দিদা পূজার্চ্চনা করে। আর কারো অতো সময় নেই। কিন্তু দিদাও দেখলাম সাধু বাবাকে দেখে আর সামনে এগোলো না। বাড়িতে একমাত্র দিদারই গুরু আছে। আর কেউ গুরুমন্ত্র নেয়নি। আর দিদার গুরু কক্ষনো আমাদের বাড়িতে আসেনি। কাছে এক গুরুভাই আছে দিদার, তার বাড়িতে গুরুদেব ওঠেন। দিদা ফল মিষ্টি নতুন কাপড় আর টাকাপয়সা সঙ্গে নিয়ে ওই গুরুভাইয়ের বাড়ি গিয়ে গুরুসেবা করে আসতো। তবে এটা আবার কে এলো!

সাধুবাবাটা এতোক্ষণে একটা হুঙ্কার ছাড়লো—

—কই, কোথায় মা লক্ষ্মী?

এতো বাঙালি! তবে একটু কম ভয় করা যায়। আমার মা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেই 'আসুন' 'আসুন' করতে করতে মহাখাতিরে ভেতরে নিয়ে গেলো।

...ব্যাপারটা কী হলো? আমরাও পিছু না ছেড়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গিয়ে দেখলাম সাধুবাবা মায়ের হাত একটা চিরকুট দিচ্ছে। আর মা আমাদের দু-ভাইবোনকে এক ধমক—

—যা বাইরে খেলতে যা।

—তবে কি মাকে চেনে ওই সাধুবাবা?—ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করল।

—কি করে বলবো! চেনে নিশ্চয়ই, নইলে এক ডাকে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো কেন মা!

—বাইরের লোকেরা 'মা লক্ষ্মী' সবার মাকে বলে।

—না। মাকে নাম ধরেই ডেকেছে। মা নিশ্চয়ই চেনে। নইলে ঘরের ভেতরে কিছুতেই ঢুকতে দিতো না।

এইসব বলাবলি করতে করতে দেখলাম বাপি এক ব্যাগ কম্বল সতরঞ্চি চাদর এসব কিনে এনে বাড়িতে এলো। আমাদেরই জিজ্ঞেস করলো, ...সাধুবাবা এসেছেন? আমরা ইতিবাচক মাথা নাড়লাম। দুভাইবোনে চোখাচোখি করে বুঝে নিলাম, ব্যাপারটা বাপি আগে থেকেই জানে। আমরা পড়লাম আতান্তরে। আমার বাপি, আর তার নাকি সাধুভক্তি! আমাদের দুজনের খেলাধুলো মাথায় উঠলো। বাপিও বললো,

—যা, তোরা খেলতে যা।

সামনের মাঠে খেলতে চলে গেলাম আমরা। কয়েকজন বন্ধুও সাধুবাবাকে আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে। আমাদের ছেঁকে ধরে প্রশ্ন করেছে—"এই তোদের বাড়িতে কোনো পুজো হবে? সাধুবাবা এলো যে।"

জানি না রে। পুজো হলে তোদের নেমন্তন্ন করবো।

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেলো ক্রমে। একজন দুজন করে পুন্যার্থীনী আসতে লাগলো বেলা বাড়তে না বাড়তে। মা তাদের সামাল দিচ্ছিল—"দেখুন, উনি হিমালয় থেকে পদব্রজে বহু কষ্ট স্বীকার করে এখানে এসেছেন। দুটো দিন অন্তত ওঁকে বিশ্রাম করতে দিন। তারপর আপনারা সবাই আসবেন।"

সবাই বারদুয়োর থেকেই প্রণাম জানিয়েই যে যার বাড়ি চলে গেল।

আমরা দু-ভাইবোন না-বুঝতে-পারা একটা গোলকধাঁধায় ঘুরে ফিরছি। ...আমার মা তো কোনোদিন পাড়ার কাকিমা জ্যেঠিমাদের দুয়োর থেকে বিদেয় দেয় না—কক্ষনো না। কী হলো তবে আজকে! আমাদেরও কাউকে ওই ঘরে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। শুধু বাপি আছে ঘরের ভেতরে সাধুবাবার কাছে। বাপির এতো সাধুভক্তি! কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে আমাদের।

চার পাঁচদিন পরেই আবার পাড়ার কাকিমা জ্যেঠিমারা এলেন সাধু দর্শনে। মা এবার ওঁদের বারান্দায় কম্বল পেতে বসালো। তারপর বুঝিয়ে বললো,

—উনি তো মৌনি বাবা। কারো সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না। মাদুলি তাবিজ ফুল ভস্ম কিছুই দেন না। দিনে একবার স্বপাকে খান। কারো দান গ্রহণ করেন না।

—তাহলে আমরা ওঁকে প্রণাম করে আসি।

—হ্যাঁ যান। তবে উনি কারো স্পর্শ গ্রহণ করেন না তো, দরজার কাছে এক এক করে গিয়ে প্রণাম করে আসুন। ভিড় করবেন না, আর শব্দ করবেন না।

আমরা ভাইবোনে আবার দৃষ্টিবিনিময় করলাম, মা কেন মিথ্যে কথা বললো! বাপির সঙ্গে দিব্যি কথা বলছে তো সাধুবাবাটা।

একজন কাকিমার পিছু পিছু গিয়ে সাধুবাবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে ধুপ ধুনোর গন্ধ আর ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। আন্দাজে ঠাওর করে নিলাম ওর ভেতরেই সাধুবাবা বসে আছেন। কাকিমারা এক এক করে দুয়োর থেকে প্রণাম সেরে চলে গেলেন।

এই সাধুবাবা আমাদের বাড়িতে টানা তিন মাস ছিলেন। আমাদের হরিঘোষের গোয়াল সংসারে একটা ঘর কেবলই এক জনের দখলে থেকে যাওয়া জীবনে প্রথম দেখলাম আমরা।

একদিন, রাত আড়াইটে তিনটের সময় বাপি কোত্থেকে যেন ফিরে এলো। মা জেগে বারান্দায় বসেই ছিল। আমি আর ভাই মায়ের কোলে দুদিক থেকে মাথা দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বাপি এসে জানাল—নৌকোয় করে পার করে দিয়ে এলাম। ওকে। বহু খোঁজ খবর করে আমাদেরই বিশ্বস্ত দুজন মাঝিকে দায়িত্ব দিয়ে এলাম। যে-কোনো সময়ে কোনো প্রয়োজনে কি করতে হবে ওদের বুঝিয়ে দিলাম। ওরাও এ ব্যাপারে বেশ পাকাপোক্ত।

এতোদিন পরে জানলাম, সাধুবাবা একজন সশস্ত্র বিপ্লবী। আন্দামানে জেলখাটা আমাদের সেই সদাজ্যেঠু হাতচিঠি সমেত ওঁকে আমাদের এখানে নিরাপত্তার কারণে কয়েকদিনের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

একেবারে সিনেমার গল্পের মতো। তখন আমার মনে হতে লাগল, কেন সাধুবাবাকে মন থেকে একটা প্রণাম করলাম না!

(চলবে)

কৃষকসভার সম্মেলনগুলি চলছে

—প্রথম পাতার পর

পরিচালনা করেন।

১৯ সেপ্টেম্বর ক্ষেতিয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হলো বর্ধমান সদর-১ ব্লক কৃষক সভার সম্মেলন। উদ্বোধন করেন সারা ভারত কৃষকসভা পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড সৈয়দ হোসেন। সম্পাদকীয় রিপোর্টের রাখেন কৃষকসভার বর্ধমান সদর-১ ব্লক কমিটির সম্পাদক হাসনাত জালালি। ৯টি অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে রিপোর্টের উপর আলোচনা করেন ১৪০ জন প্রতিনিধির থেকে ৯ জন। শ্রমিক ফ্রন্ট, ক্ষেতমজুর ফ্রন্ট ও যুব মহিলা ফ্রন্টের পক্ষ থেকে সম্মেলনে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মহবুব আলম, সেখ সালালউদ্দিন, অপর্ণা সাহা, চন্দন সোম। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা দেবু রায়, দেবদাস বসু। সম্মেলন থেকে ২৫ জনের নতুন কমিটি নির্বাচন হয়, যার সভাপতি নির্বাচিত হন জয়হিন্দ ঘোষ, সম্পাদক পুনরায় নির্বাচিত হন হাসনাত জালালি। সম্মেলন কে কেন্দ্র করে ক্ষেতিয়া এলাকার কর্মীরা বাড়ি বাড়ি পোঁছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রহের মধ্য দিয়ে সারা এলাকা লাল পতাকায় সাজিয়ে ৩০০-র বেশি মানুষের সমাগম ঘটিয়ে সম্মেলন সফল করেন।

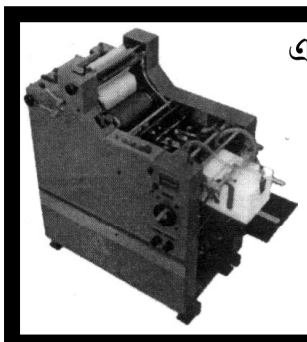

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা